নামের জন্ম : FNU আর মুকিম

সৈয়দ মাহতাব আহমেদ

নামের জন্ম : FNU আর মুকিম
সৈয়দ মাহতাব আহমেদ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্যঃ ২৬০ টাকা

Namer Jonmo: FNU Are Mukim by Syed Mahtab Ahmed Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudra-E-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 260 Taka RS: 260 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97450-9-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

আমার স্ত্রী শামীমা, যে সবসময় কথা এবং কাজে, অকাতরে, অফুরন্ত প্রেরণা জুগিয়েছে বইটি লেখার ব্যাপারে। অশেষ ধন্যবাদ।

সূ চি প ত্র

সতেরোই নভেম্বর আর একুশে ফেব্রুয়ারি :
শোচনীয় বাংলাদেশের শাব্বাশ বিস্ময়কর বাংলাদেশে উত্তরণ ৯
ডাক্তারের স্তর বিন্যাস ১৪
অপচয় ১৮
সুন্দরী ২৩
আমার বুলি ৩১
মাতৃ দিবসে প্রতিদিনের কথা ৩৮
মির্জা গালিব ৪২
বুরজুল-আরাব– দুনিয়ার একমাত্র সেভেন স্টার হোটেল ৪৭
সালেহা সাহিত্যিক নয় ৫৬
প্রভুভক্ত ৬৪
অভিন্ন ত্রয়ী ৬৯
কোভিড ১৯ অতিমারী, দুর্যোগ ও সাহিত্য ৮০
হালাল ঔষধের সন্ধানে ৮৯
আজি হতে শতবর্ষ আগে ৯৩
নামের জন্ম : FNU আর মুকিম ৯৭

সতেরোই নভেম্বর আর একুশে ফেব্রুয়ারি : শোচনীয় বাংলাদেশের শাব্বাশ বিস্ময়কর বাংলাদেশে উত্তরণ

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে যত পবিত্র, একুশে ফেব্রুয়ারির উত্তরসূরি সতেরোই নভেম্বর আমাদের কাছে ততটা নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার পাওনা আর যোগ্য মর্যাদা দিয়েছে। সতেরোই নভেম্বর তেমনি স্বীকৃতি দিয়েছে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে। সে স্বীকৃতি এসেছে জাতিসংঘ থেকে, দুনিয়ার নিপীড়িত হাজারো মাতৃভাষাকে বাঁচাতে। আর সেটা হয়েছে আবার বাংলাদেশেরই কৃতি সন্তানের চেষ্টায়।

আমার জন্মের আগে দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান নামে এক দেশের জন্ম হয়। নব্য রাষ্ট্র পাকিস্তান তার জন্মের পরপরই তার নাবালক উর্দু ভাষাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তার থেকে হাজার বছরের মুরুব্বি বাংলা ভাষাকে গলা টিপে বসে, মেরে ফেলবে বলে। সে ছিল এক বর্বর অপসাহস। কারণ কুলীনতা বা আভিজাত্যের পাল্লায় বাংলা যেখানে হাজার বছরের ঐতিহ্যের ফলে ব্রাহ্মণ তুল্য ছিল, উর্দু সেখানে ছিল নমঃশূদ্র তুল্য জোড়াতালি দেয়া এক নবজাতক। তার নিজস্ব কোনো শব্দ, বর্ণ, ব্যাকরণসহ একটি ভাষার উপকরণ বলতে কিছুই ছিল না। এমনকি অন্যান্য ভাষার মতো উর্দুর জন্মের কোনো প্রাকৃতিক তাগিদও ছিল না। তাগিদটা ছিল এক বিশেষ মহলের। অন্যভাবে বললে, সামাজিক প্রয়োজনে একটি ভাষা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে রূপ নেয়। অন্যদিকে উর্দুকে এক অর্থে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হয় বিশেষ উদ্দেশে মাত্র ৪০০ বছরেরও অল্প সময়ে। আর যেহেতু এটি প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনের স্বাভাবিক ফল নয়, তাই উর্দু ভাষার মিস্ত্রিরা এটা বানাতে শব্দ, বর্ণ, ব্যাকরণসহ সমস্ত উপকরণ নিয়ে আসে বাংলা, হিন্দি, আর আরবিসহ বিভিন্ন ভাষা থেকে। উর্দুর লেখার বর্ণ হচ্ছে আরবি থেকে ধার করা, আর ব্যাকরণ মূলত হিন্দি থেকে। সুতরাং নাবালক পাকিস্তানের দুঃসাহসিক অপচেষ্টা যে বীর বাঙালি জাতির কাছে অঙ্কুরেই মারা যাবে, সে তো ছিল অনিবার্য। জিন্নাহর বাংলা রাষ্ট্রভাষার অস্বীকৃতির প্রথম প্রতিবাদ আসে স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকে আর সে প্রতিবাদ তুঙ্গে ওঠে একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে। বাংলার রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতির বাকি সামান্য সময়টা ছিল মূলত আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মাত্র সিকি শতাব্দী পর নতুন সহস্রাব্দী ২০০০ সাল শুরুর প্রাক্কালে ১৭ই নভেম্বর, ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। যা নাকি বাংলা ভাষাকে বিশ্বায়নের যাত্রাকে দেয় এক নতুন মাত্রা।

এসবই ছিল অনেকের মতো আমার কাছেও ইতিহাসের কালো অধ্যায়। কিন্তু গত কয়েক যুগে নিজে যা প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে আজ যে অনেকটাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি– তাতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে স্বস্তির সময়টার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল কিছুদিন। দেশের বাইরে বিশেষ করে দেশ স্বাধীনের পরপর কিছুটা সময় পাকিস্তান যুগ থেকে বয়ে আনা দুর্দিনের বোঝা বইতে হয়েছিল কয়েক বছর। জাপানিদের মুখে বাংলাদেশ সুগোই দেস নে (করুণ অবস্থা) শোনাটা ছিল তেমনি একটা সময়। ভাগ্যদোষে বা ভাগ্যগুণে যাই হোক না কেন, এ পর্যন্ত জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় কেটেছে বাংলাদেশের বাইরে। প্রথমেই ছিল জাপান, যেখানে পড়াশোনা, গবেষণা আর চাকরি মিলিয়ে থেকেছি দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি কাল। বলাই বাহুল্য জাপানের প্রতি আমার আছে এক বিশেষ কৃতজ্ঞতা বোধ। তাই জাপান ছাড়ার দুই যুগ পর ২০১৮ সালে আবার সস্ত্রীক সেখানে যাই পুনর্ভ্রমণে, যেখানে এখনও আমার হোস্ট মাদার রয়েছেন। ১৯৮৪ সালে কিয়োতোতে আমি প্রথম থাকি য়ামাসিনা ছাত্রাবাসে, কয়েক মাস পরে আমার স্ত্রী আসলে সুগাকুইন ছাত্রাবাসে চলে আসি। সুতরাং পাঁচ বছর আগের জাপান পুনর্ভ্রমণের শুরুতেই কিয়োতোকে বেছে নিই। কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে আমার পিএইচডি, পোস্টডক আর চাকরি মিলিয়ে আমাদের জাপান বাসের সিংহ ভাগ কেটেছিল এখানেই। প্রথমেই মনে হলো সুগাকুইন ছাত্রাবাস দিয়েই স্মৃতি রোমন্থন শুরু হোক। কিয়োতোর কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই সুগাকুইন ছাত্রাবাসকে ঘিরে। এখানে কয়েকজন বাংলাদেশি ছাত্র ছিল বলে গল্পছলে অনেক জাপানিও শেখা হয়ে যেত। কিয়োতোতে পৌঁছার কয়েক মাস কেটে যাবার পর জাপানি ভাষা ধীরে ধীরে বোঝা আর বলা শুরু করেছিলাম। রাস্তাঘাটে অনেকের সাথেই দেখা হলে, কুশলাদির এক পর্যায়ে "ওকুনি ওয়া"? মানে আমার দেশ কোথায় প্রশ্নটাই চলে আসত। আমার দেশ কোথায় প্রশ্নের উত্তর দিতাম বুক উজাড় করা গর্ব ভরে। কিন্তু একি? আশ্চর্যের সাথে পরের প্রশ্ন আসে "বাঙ্গুরাদেস? দোকো দেস কা"? বাংলাদেশ? সেটা কোথায়? বোকার মতো প্রশ্ন শুনে কোনো সময় মেজাজ যেত খাট্টা হয়ে, অন্য সময় পায়ের রক্ত যেত মাথায় চড়ে। শিক্ষিত দেশের লোক তোরা, আর কিছু না জানিস, একটা দেশের নামটা তো অন্তত জানবি! এ দুঃখ সামলানো যে দিনে দিনে অসহনীয় হয়ে উঠছিল। সেখানে তখন আওয়াল আকন্দ নামে বাংলাদেশের এক বন্ধু (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) থাকতেন আমাদের একই সুগাকুইন ছাত্রাবাসে পরিবার নিয়ে। আওয়াল আকন্দ আমার বছর আটেক আগে, মানে ১৯৭৬ সালে জাপান গিয়েছিলেন জাপান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একই মনবুশো বৃত্তি নিয়ে। আমি জাপান যাবার আগেই আমার ভাই আশরাফ আহেমেদের কাছে আওয়াল সাহেবের কথা শুনেছিলাম। একিদন গল্পের সময় আক্ষেপ করে উনাকে বললাম আমার দুঃখ আর মেজাজ খারাপের কথাটা। আওয়াল ভাই শুনে বললেন মাহতাব সাহেব, সব কিছুর মতো ভালো আর খারাপ, অথবা ভালো লাগা আর খারাপ লাগার ব্যাপারও

আপেক্ষিক। আর এত সামান্যতে খারাপ লাগলে আল্লাহ্ নারাজ হয়ে খারাপের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উনার দিকে তাকালে উনি বললেন শোনেন তাহলে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার মাত্র চার বছরের মধ্যে উনি আসেন এদেশে। তখন জাপানিরা জিজ্ঞেস করত “কুনি ওয়া দোকো দেস কা?” (আপনার দেশ কোথায়?) শুনে উনিও আমার মতোই পরের প্রশ্নে পেতেন আঘাত। বললেন তারপর উনার ব্রত ছিল জাপানিদেরকে বাংলাদেশ চেনানো। উনার সে প্রচেষ্টা আর সময়ের সাথে মিডিয়ার কল্যাণে জাপানিরা ধীরে ধীরে বাংলাদেশকে চিনে যায়। ফলে তারা “নতুন প্রশ্ন কী করে জানেন?” এখন তারা কিসিঞ্জারের তলাবিহীন সুরে সুর মিলিয়ে বলে “বাঙ্গুরাদেসু তাইহেন দেস নে!” মানে বাংলাদেশের তো শোচনীয় অবস্থা! এই বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন এখন ভাবি মাহতাব সাহেব, “বাঙ্গুরাদেস দোকো দেস কা” (বাংলাদেশ কোথায়) যে “তাইহেন দেস নে” (শোচনীয়) থেকে অনেক ভালো ছিল।

শুনে আমি আমার দু’গাল বেয়ে পরা নোনতা পানি তাড়াতাড়ি মুছে ফেলি। এর কিছুদিন পরই মনিব নিক্সনসহ কিসিঞ্জার সাহেব কুপোকাত হয়ে তৈরি করলেন ইতিহাস। আর জাপান তার খেসারতটা কিছুদিনের মধ্যেই দিয়েছিল সরাসরি বাংলাদেশের কাছেই। বিংশ শতাব্দীর বর্গি পাকিস্তানি হায়েনারা বাংলাদেশ থেকে ঝাঁটার বাড়িতে পালানোর পর এখন অর্ধ শতাব্দী গত হয়েছে। আর এর নানাবিধ সুফল পাওয়া শুরু করেছি আমরা ইতোমধ্যে। এর বিরাট এক লিস্ট জমা হচ্ছে আমাদের চারদিকে। এর একটি হচ্ছে বাংলাদেশ এই জাপানকে হারিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ করেছিল বহু আগেই ১৯৭৯-৮০ সালে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হবে যে, জাপান আজ বাংলাদেশের উন্নয়নের এক বিরাট অংশীদার এবং জাপানকে খাটো করা আমার মোটেও ইচ্ছা নয়। কথা দীর্ঘ না করে আমি ফিরে আসতে চাই মাতৃভাষা বাংলা আর একুশে ফেব্রুয়ারি প্রসঙ্গে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য রক্ত দেয়ার মাধ্যমে যে ইতিহাসের শুরু, তা আজো সৃষ্টি করে যাচ্ছে নিত্যনুতন ইতিহাসের অধ্যায়। ১৯৯৮ সালের ৯ই জানুয়ারি কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরে বসবাসরত দুই বাঙালি সর্বজনাব রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম প্রাথমিক উদ্যোক্তা হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানিয়েছিলেন জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের কাছে। আবেদনের উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়া জুড়ে হাজার হাজার বিপন্ন ভাষাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা। উল্লেখ্য যে, দুনিয়াতে ৭,০০০ এর ও বেশি ব্যাবহৃত ভাষা আছে, যার এক তৃতীয়াংশই এখন বিপন্ন ভাষা। ২০০৪-এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ৭,০০০ ভাষার ৯০ শতাংশই বিলুপ্ত হয়ে যাবে ২০৫০ সালের মধ্যে! সুতরাং তথ্য ও ডাটা ভিত্তিক আবেদনটি ছিল বিশ্বব্যাপী এক স্পর্শকাতর বিষয় আর একই সাথে সময়ের দাবি। অতঃপর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এ রকম একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে সরকারিভাবে পদক্ষেপ নেয়।

সে সময় জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রধান তথ্য কর্মচারী হিসেবে কর্মরত বাংলাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক জনাব হাসান ফেরদৌসের নজরে এ চিঠিটি আসে। তিনি সপ্তাহ পার হতে না হতেই তৎক্ষণাৎ ১৯৯৮ সালের ২০শে জানুয়ারি রফিকুল ইসলাম সাহেবকে অনুরোধ করেন তিনি যেন জাতিসংঘের অন্য কোনো সদস্য রাষ্ট্রের কারো কাছ থেকে একই ধরনের প্রস্তাব আনার ব্যবস্থা করেন। পরে রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম 'মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' নামে একটি সংগঠন দাঁড় করান। এতে একজন ইংরেজিভাষী, একজন জার্মানভাষী, একজন ক্যান্টোনিজভাষী সদস্যও ছিলেন। তারা আবারো কফি আনানকে 'এ গ্রুপ অব মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর পক্ষ থেকে একটি চিঠি লেখেন, যে চিঠির একটি কপি জাতিসংঘের কানাডীয় দূত ডেভিড ফাওলারের কাছেও প্রেরণ করা হয়।

আমরা ধারণা করতে পারি যে একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত জনাব রফিকুল ইসলামের উদ্বেগে সে চিঠিতে নিম্নে বর্ণীত বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কিত কিছু মূল্যবান তথ্যও সন্নিবেশিত হয়েছিল। বাংলা ভাষা বিকাশের ইতিহাস ১৩০০ বছর পুরনো। অষ্টম শতক থেকে বাংলায় রচিত সাহিত্যের বিশাল ভান্ডারের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষে এসে বাংলা ভাষা তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহণ করে। মাতৃভাষীর সংখ্যায় বাংলা ভাষা হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের পঞ্চম ও ব্যবহারকারির সংখ্যা অনুসারে বাংলা বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম ভাষা। বাংলা ভাষা সার্বভৌম বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা; ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা। এছাড়াও ভারতের আরও ৫-৬টি রাজ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাংলাভাষী জনগণ রয়েছে। ফলে ভারতে হিন্দির পরেই সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা হচ্ছে বাংলা। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান কথ্য ভাষাও বাংলা। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা ও ইউরোপে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাংলাভাষী অভিবাসী রয়েছে। সব মিলিয়ে বিশ্বে ২৬ কোটির অধিক লোক দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ব্যবহার করে। বাংলাদেশের এবং ১৪০ কোটি জনসংখ্যার ভারতের জাতীয় সংগীত বাংলায় রচিত।

উল্লেখিত বাংলার তথ্যভান্ডার নিয়ে ১৯৯৯ সালে সর্বজনাব রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কোর আনা মারিয়ার সাথে দেখা করেন। এবং আনা মারিয়ার পরামর্শ অনুযায়ী তাদের একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাবটি ৫টি সদস্য দেশ– ক্যানাডা, ভারত, হাঙ্গেরি, ফিনল্যান্ড এবং বাংলাদেশ দ্বারা আনীত হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় ও এতে ১৮৮টি সদস্য দেশ সমর্থন জানালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এতদিন পর আমাদের শহিদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারির এভাবেই উন্নয়ন হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে। এবং আমার বিশ্বাস, এভাবেই স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো সর্বজনাব রফিকুল ইসলাম, আব্দুস সালাম আর হাসান

ফেরদৌসের নাম লেখা হয়ে গেল প্রথম কাতারে একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদ সালাম, বরকত, জব্বার, সাফিউর আর রফিকের মতো বীরের খাতায়।

এভাবেই আজ থেকে প্রায় সিকি শতাব্দী আগে নতুন সহস্রাব্দী (২০০০ সাল) আগমনের আগেই বাংলাদেশ পায় আরও এক মহা সম্মাননা। একুশ শতাব্দীর ঘণ্টা বাজার ঠিক পূর্বমুহূর্তে সে ঘণ্টাকে ম্লান করে বিশ্বব্যাপী বেজে ওঠে ভিন্ন এক ঘণ্টা। কানাডাবাসী একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত জনাব রফিকুল ইসলামের উদ্বেগে সে ঘণ্টা বাজায় জাতিসংঘ। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ স্বীকৃতি আদায়ের পেছনে বাংলাদেশের আবেদনকে প্রাথমিকভাবে সমর্থনকারী সীমিত সংখ্যক বিদেশি রাষ্ট্রের মধ্যে ছিল সেই হানাদার দেশটি, যার গোঁয়ার্তুমির ফলেই একুশে ফেব্রুয়ারি হয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারি– আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মনে হয় কবিরা গুনাহর কাফফারা হিসাবে এটা ছিল তাদের একটি প্রতীকী ক্ষমা প্রার্থনা। অথবা বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান উন্নতি আর সাফল্যকে সময় থাকতে স্বীকৃতি দিয়ে নিজদেরকে আন্তর্জাতিক ফড়িয়ার পরিচয় থেকে রক্ষা করার এক প্রচেষ্টা, যেমনটি হয়েছিল মাত্র অর্ধশতাব্দী আগে। ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর জাতিসংঘের ৬৫তম অধিবেশনে প্রতিবছর জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করবে এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বাংলাদেশ। আর ১১৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতিসংঘের তথ্যবিষয়ক কমিটিতে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে পাস হয়।

সাফল্যের আর একটি উদাহরণ না দিলেই নয়। ডক্টর ইউনূসের কৃতিত্ব আর স্বীকৃতি বাংলাদেশকে পৌঁছে দিয়েছে বিশ্ব নোবেল ক্লাবে। এখন আর আমাদেরকে বাংলাদেশ তাইহেন দেসনে (বাংলাদেশের শোচনীয় অবস্থা) না শুনে বরং শুনতে পাই বাংলাদেশ সুগোই দেসনে (শাব্বাশ, বিস্ময় বাংলাদেশ)।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

ডাক্তারের স্তর বিন্যাস

ভাই, আপনাদের কিন্তু পড়াশোনা করতে হবে ঠিকমতো। আপনারা এসএসসি আর এইচএসসিতে ভালো রেজাল্ট করা ছাত্র। আসলে ভালো রেজাল্ট করা ছাত্র বললে ঠিক বলা হলো না। আপনারা হচ্ছেন টপ ওয়ান পারসেন্ট ছাত্রদের একেকজন। তারপর একদিন আপনারা হবেন এমবিবিএস ডাক্তার। এ ছাড়া আপনাদের উপরে আছেন এফসিপিএস, তার উপরে আছি আমাদের মতো বিলেত ফেরত এফআর সিএস আরএম আরসিপি-রা। শুধু তাই না, আপনাদের নিচেও আছে একাধিক পরত। প্রথমেই আছেন এলএমএফ, তারপর আছেন ফারমেসিস্ট, নার্স, আর কম্পাউনডার। ভাই, বিশ্বাস করেন আর নাই করেন, থানা হাসপাতালের ঝাড়ুদারও সুযোগ পেলেই তার এলাকায় ডাক্তারি করেন। তাই ভাই বুঝতেই পারছেন, আপনাদেরকে এত বড় প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকে থাকতে হবে।

কথাটা বলেছিলেন সার্জারির বিখ্যাত অধ্যাপক প্রয়াত কবিরুদ্দিন স্যার আমাদের প্রথম দিনের সার্জারি ক্লাসে। উনি সব ছাত্রছাত্রীসহ সবাইকেই আপনি আর ভাই বলে সম্বোধন করতেন যার জন্য উনার ডাকনাম ছিল ভাই কবির স্যার। স্যারের কথাটা শুনে আমরা সবাই হেসেছিলাম, কিছুটা বুঝে আর বেশিটা না বুঝেই। তবে স্যারের কথার পুরোটাই যে আক্ষরিক অর্থেই সত্য, সেটা বুঝেছিলাম পাস করার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহকুমার সরাইল থানা হাসপাতালের সরকারি চাকরিতে গিয়ে। চাকরির দুসপ্তাহের পর একদিন গ্রামে দুই দলের মারামারির পর ওয়ার্ডে আমার অধীনে হাতে ব্যথা নিয়ে এক রোগী ভর্তি হয়। আমি খবর পাওয়া মাত্র ওয়ার্ডে গিয়ে দেখি রোগীকে আমি দেখার আগেই, হাসপাতালের ঝাড়ুদার রোগীর আহত হাতের তালু থেকে কাঁধ পর্যন্ত মোটা এক ব্যান্ডেজ লাগিয়ে ফেলেছে। ঝাড়ুদার ডাক্তারের ধারণা, ব্যান্ডেজ যত বড় হবে, প্রতিপক্ষের প্রতি তা হবে আমার রোগীর জন্য তত বড় অস্ত্র, যখন ব্যাপারটা কোর্টে যাবে। উল্লেখ্য যে রোগীর ভর্তিটা যতটা না ছিল তার চিকিৎসার জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল কোর্টে জেতাটা নিশ্চিত করার জন্য।

মুহূর্তেই ছাত্রজীবনে দেখা এক জীবিত রোগীর হাতের অকাল মৃত্যুর স্মৃতি ভেসে আসে চোখের সামনে। আবার সেই ভাই কবিরুদ্দিন স্যারেরই প্রসঙ্গ। ঘটনাটা ছিল আমাদের তৃতীয় বর্ষে অস্ত্রোপচার কক্ষে এক রোগীকে নিয়ে। অস্ত্রোপচারের আগে নিয়মমাফিক স্যার রোগীর সমস্যা, সমস্যার কারণ এবং তার প্রতিকার তথা চিকিৎসার

ব্যাপারে এক সারসংক্ষেপ বর্ণনা দিলেন। স্যার প্রথমেই ভূমিকায় বললেন ভাই, সাবধান হওয়া ভালো– অতি সাবধান নয়। যেমন ট্রেনে উঠেই এক যাত্রী দেখে কামরার ভেতর জানালার উপরে লেখা, "পকেটমার হইতে সাবধান, পকেটমার আপনার পাশেই আছে।" দেখা মাত্র সে তার পাশে বসা সহযাত্রীর শার্টের কলার চেপে ধরে 'পকেটমার, পকেটমার' বলে কিল-ঘুসি মারতে থাকে। কামরা ভর্তি সব যাত্রী তো তাজ্জব। ঘটনা বেশি দূর গড়ানোর আগেই কোনো এক বিবেকবান লোক পুলিশ ডাকল। ফল হলো যা হবার তাই। পুলিশ এসে পকেটমারকে ছেড়ে উল্টো সাধু সাবধানীকেই বেঁধে নিয়ে গেল। ভূমিকার শেষে স্যার বললেন, এই রোগী হচ্ছে এক চা বাগানের কুলি। গ্রীষ্মের আগুন ছড়ানো ভর দুপুরে সে কুলি ওঠা শুরু করে তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতো ১০০ ফুট লম্বা এক প্রবীণ ডাব গাছে। মনে মনে দৃশটা ভাবার চেষ্টা করলাম। ছোটবেলায় অনেক দেখেছি অবাক দৃষ্টিতে। কী সুন্দর আর পটু ভাবে একের পর এক দুটি হাত দিয়ে প্রথমে কাণ্ডের উপরের অংশকে বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরা। তারপর দড়ি দিয়ে বাঁধা পা জোড়াকে একসঙ্গে হঠাৎ করে উপড়ে টেনে নেয়া। ভাবলে দেখবেন এই কৌশলের সাথে একটা কলা মানে আর্টও জুড়ে আছে। ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার বুঝতে পারি ৩ যুগ আগে হাওয়াইয়ে বেড়াতে গিয়ে। পলিনেসিয়ান ভিল্যাজ নামে এক বিনোদন পার্কে একদিন যাই জাপানি সহকর্মীদের সাথে। বলা হলো সেদিনকার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে মানবরূপী এক বানরের গাছে চড়া। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট অরণ্যে লোকে লোকারণ্য। পর্যটকদের সামনে যথাসময়ে আবির্ভাব হলো সে প্রাণীটি এক ডাব গাছের নিচে, যে নাকি দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য সেজে ছিল আকর্ষণীয়ভাবে। বলাই বাহুল্য, সাজের ভেতরের প্রাণীটি ছিল আমার মতোই এক আদম সন্তান। ততক্ষণে আমার আদম সন্তানের গাছে চড়ার দৃশ্য দেখার আগ্রহের বদলে নিজের উপর হলো ভীষণ রাগ, এতক্ষণ মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য। পিছুপা হবার চিন্তা করতেই বুঝলাম পিছুপা হবার কাজটা হবে দুরূহ। কারণ তামাম জনতা মহানন্দে সে দৃশ্য উপভোগ করছে দারুণ আশ্চর্য চোখে। আর তখনি ভেবেছিলাম, তাই তো! এ শ্রম তো এক নিপুণ শিল্পীর কাজও বটে। না হলে বিভিন্ন দেশের এত লোক বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে থাকবে কেন? আর কর্তৃপক্ষ একে দু'পয়সা কামাবার চিন্তাই বা করবে কেন?

আর সে কাজটাই করতে হতো আমাদের সেই শ্রমিক ভাইকে যখন তখন। সেদিন বিলেতি মেজাজের দেশি সাহেব তার কুলিকে বলেন তাজা ডাব পেড়ে আনতে। ১০০ ফুট উঁচু গাছের এক তৃতীয়াংশ ওঠার আগেই ঘর্মাক্ত পিচ্ছিল ক্লান্ত হাত ফসকে তিনি পড়ে যান গাছের গোড়ায় মাটিতে। ব্যাচারা বেঁচে যায় প্রাণে, তবে নিজের ডান হাতের প্রাণের বিনিময়ে। শুরুতেই হাতের হাড়টা ভাঙে। তার তো তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার দরকার, হাতের কাছেই আছে হাতুড়ে ডাক্তার। আর হাড় ভাঙা চিকিৎসার মূল মন্ত্রই হচ্ছে ভাঙা হাড় বা অঙ্গকে বেঁধে স্থির আর নিশ্চল করে দেয়া। সুতরাং গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে রোগীর হাতটাকে একটা

গামছা পেঁচিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিশ্চল করে দেন। দুই দিন পার না হতেই রোগীর হাতের রক্ত চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধের ফলে তার হাতে পচন ধরে যায় যার একমাত্র চিকিৎসা হাত কেটে ফেলা। আর সে জন্যই রোগী আজ হাসপাতালে ভাই কবির স্যারের কাছে। বলাই বাহুল্য যে, আমি সেদিন সাথে সাথে আমার সরাইলের রোগীকে পরীক্ষা করে তার ঝাড়ুদার ডাক্তারের প্যাঁচানো ব্যান্ডেজটা খুলে দিয়েছিলাম। এভাবে সেদিন আমার রোগীর হাতটা নিশ্চিত বেঁচে যায়। অবশ্য মামলায় তার কী হয়েছিল সে খবর রাখিনি। কাজ সেরে অনেকটা মন খারাপ নিয়েই আমার কামরায় বসে থাকি কিছুক্ষণ। তখনি আমার কামরায় ঢোকেন আমার এক ঊর্ধ্বতন সহকর্মী হাতে এক কাপ চা নিয়ে। আমাকে বিষণ্ন বদনে দেখে কারণ জানতে চাইলে কিছুক্ষণ আগে দেখা অরাজকতার কথাটা বলি। আমার অভিজ্ঞতা শুনে আমার সহকর্মী আমাকে সান্ত্বনার সুরে বললেন এজন্য তোমার মন খারাপ, মাহতাব? বললাম, না এই আর কি! সহকর্মী বললেন শোনো, বলে জুত করে চেয়ারটা টেনে বসে বলা শুরু করলেন। আমি একদিন সে ডাক্তার বাবুকে বললাম, কলিমুদ্দিন তুমি তো এখানে অনেকদিন কাজ করছ, কিছু ব্যান্ডেজ-ট্যান্ডেজ দেয়া শিখেছ? তার চেহারায় বোঝা গেল প্রশ্নটা তাকে অপমান করেছে। কিন্তু উত্তর দিল খুব তমিজের সাথে– "স্যার, আপনারা পাশে থাকলে দু-একটা পেটও কেটে ফেলতে পারি।" শুনে আমি মনে মনে বললাম কবিরুদ্দিন স্যার, তোমাকে সালাম! আমাকেও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে।

এরপর কয়েক মাস কেটে গেল। তখন মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি নিয়ে যাওয়াটা ছিল একটা কৃতিত্ব, আর অন্যান্য পেশাদারী আর অপেশাদারীদের সাথে ডাক্তাররাও লেগে যায় সে চেষ্টায়। ভাবলাম আমারও যদি সে রকম একটা সুযোগ এসে যায়! তার আগেই বরং আমার যত সনদপত্র আছে, সব জোগাড় করে হাতে নিয়ে রাখা ভালো। তাই ছুটি নিয়ে যাই কুমিল্লা আলিয়া মাদরাসায় যেখানে বহুদিন আগে পড়াশোনা করে পাস করলেও, এতদিন সনদপত্র জোগাড়ের চিন্তা করিনি। প্রথমেই দেখা করলাম প্রিন্সিপালের সাথে। এতদিন পর পরিচিত শিক্ষকদের মাঝে মাত্র একজনকেই দেখতে পাই। পরিচয় দিয়ে কাজের কথা বললাম। সৌজন্যমূলক প্রশ্নের উত্তরে জানালাম এখন ডাক্তারি করি। প্রাথমিক আলাপের পর পাশের রুমে সেক্রেটারির সাথে যখন পুরনো ফাইলে আমার সনদপত্র খোঁজায় ব্যস্ত, তখন ঢুকলেন সেই একমাত্র পরিচিত শিক্ষক। বললেন, মাহতাব, বলেছ তুমি নাকি এখন ডাক্তারি করছ! তা তুমি কি কিছু ডাক্তারি পড়াশোনা করেছ? কবিরুদ্দিন স্যার, আবারো আপনাকে সালাম! আপনার জন্যই মুহূর্তে আমি বুঝে গেছি প্রশ্নের মানেটা। আর তাই ব্যাখ্যা আর ভূমিকা ছাড়াই হুজুরের বোঝার ভাষাতেই উত্তরটা দিলাম। বললাম, হুজুর কলেজ পাসের পর আরও ৫ বছর পড়াশোনা করে ডাক্তারি মানে এম বি পাস করেছি। শুনে হুজুর খুশি আর আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "মাশাল্লাহ, মাশাল্লাহ, এ তো আমাদের অনেক গর্বের কথা। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি কোনো কম্পাউনডারের সাথে থেকে কিছু ডাক্তারি শিখেছ!" হ্যাঁ, আমার ডাক্তারি একজন কম্পাউনডারের ডাক্তারিও না,